বাঁচা না বাঁচার খেলা যদি চলে সারাবেলা

অভিরূপ মিত্র

আলোচ্য গ্রন্থ : 'কে বাঁচে কে বাঁচায়' এবং সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য রচনা

মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকার স্বত্ত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হককে ধন্যবাদ হাসান আজিজুল হককে 'কে বাঁচে কে বাঁচায়, -এর মাধ্যমে নতুন করে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। ধন্যবাদ 'মহাযান' পত্রিকা সম্পাদককে এমন প্ররোচনামূলক পাঠে বাধ্য করার জন্য। ধন্যবাদ আলোচ্য লেখকমহোদয়কেও যিনি ''না-লেখা''র স্পেস্ থেকেও টেনে এনেছেন ''ভাসা, ভাসা, শুধুমাত্র নজর বুলনো, ঝর ঝর করে পার হয়ে যাওয়া'' ছবির কথামালা। লিখনে কী ঘটে সে প্রশ্ন অমিয়ভূষণ তোলার আগেও ছিল, পরেও থাকবে—কিন্তু একটা কথা এই মহৎ লেখক সম্বন্ধে সহজেই বলা যায় যে তাঁর সব লেখার মধ্যে দিয়ে তিনিই 'হাঁটেন, হেঁটে আসেন— পরিবর্তিত প্রস্থানে নতুন লেখক পুরাতনেরই নির্মাণ। তাই বোধহয় ''জবাবদিহি''র টিলার দাঁড়ানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না — অজুহাতের তো প্রশ্নই নেই।

বইটি হাতে পাবার আগে পত্রিকা সম্প্রাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বইটির জ্যঁর্টা কী? শুনে মনে হয়েছিল ট্র্যাভেলোগ; পড়া শুরু করে দেখা গেলো, গোষ্ঠী বিচার এত সহজ নয়। তবে সমভূমি থেকে ঘুরে ঘুরে লেখকের সঙ্গে ওপরে উঠার যাত্রা শুরুতে দেখা যায় এ যে হার্ডির ওয়েসেক্স উপন্যাসের অবতরণিকা। বিচিত্র লেখকের অনুভব। ''পাহাড়ের মিছিলকে'' তাঁর ''মনে হয চলিষ্ণু'' —নগও সচল হয সেই অনুভবে। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে দৃষ্টিপাতে খানিকটা নিচু জমিতে যে চাষবাসের (পৃঃ ১২) ছবি আসে তা মানসপটে ভাসিয়ে তোলে ওয়ার্ডসওয়র্থের ''সলিটারি রীপার'' - এক স্কটিশ চিত্রপট। তারপরই আসে তুচ্ছতা প্রকাশ অবাধ উপমা 'হাসি - পাবার মতো নদী বা খাল''। লেখক অনায়াসে 'পানি'' বা ''একিন'' (পৃঃ ৭৫) শব্দগুলি ব্যবহার করেন। ''শব্দের সুরুচির জাযগায় রুক্ষ্ম কার্যকারিতা'ই লক্ষ্য তাঁর। তাঁর দৃশ্যমান জগতে গাড়িও অযান্ত্রিক হয়ে ওঠে (পৃঃ ১৩); ''ঘড় ঘড় করে প্রচণ্ড পরিশ্রমের শব্দ করে''। মানবায়নের মতই সহজে আসে বহুত্ব প্রকাশ বাক্যাংশ, ''শাল, সেগুন, অপরিচিত গাছ, আবার অপরিচিত গাছ''। তবে লেখক যতই বলুন ভাসা দেখা, তাঁর তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা, দৃশ্যমানতা, নির্জন জঙ্গল ও পাহাড় দেখলেও, পরে মানবিক আগ্রহ অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটায়, স্বেচ্ছায় জেনে নেন ওই বন্ধুর নির্জনতার মধ্যেই চাকমা জাতিগোষ্ঠীর বাস (পৃঃ১৩)। শুধুমাত্র প্রকৃতি আর প্রকৃতি— নির্মানব প্রকৃতি — এমন প্রেক্ষাপট এ লেখকের নয়, কারণ তিনি জানেন, ''সব গল্পই শেষ পর্যন্ত মানুষের কাহিনী'' (পৃঃ ১৪)। সেই মানবের প্রতি প্রকৃত দরদ থেকেই তিন অনুভব করেন, ''যে প্রকৃতি বহিরাগতদের কাছে মনোরম, সেই প্রকৃতিই এইসব পাহাড়ি মানুষদের কাছে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর'' (পৃঃ ঐ)। কিন্তু বন্যরা তো বনে কেবল সুন্দরই নয়, সমস্ত বন্যতার সঙ্গে লড়াই করেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়। ''এই জন্যে, এরা, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বটে, আবার এরকম করে ভালোও বাসে তাকে'' (পৃঃ ১৫)। ফলত উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠে এক অস্তিত্বগত অবিচ্ছেদ্যতা। এই অবিচ্ছিন্নতা থেকেই মানুষের মহাপ্রস্থানের যাত্রাসঙ্গী সারমেয় হয়ে ওঠে তার নৈর্ব্যক্তিক অনুবন্ধনও (Objective Correlative)ঃ ''একদিকে লাল রং -এর ছোট বুনোজাতের কুকুরটি রোদ এবং ছায়ায় শুয়ে নির্বিকারভাবে চোখ মিট মিট করছে। তার চাউনিতে কঠিন পার্বত্য জীবনের ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে একটি অকুতোভয় বন্য প্রকৃতি উঁকি দিচ্ছে'' (পৃঃ ১৬)।

মানব - শ্বাপদ উভয়েই সেখানে উন্নয়নের শিকার। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেওয়া হয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আর উন্নয়ন - উদ্বাস্তু হয়ে যায় বিরাট চাকমা জনগোষ্ঠী। লেখকের মর্মন্তুদ স্বীকারোক্তি, ''এই বিরাট ব্যাপারটি বর্ণনার বিষয নয়'' (পৃঃ ১৬)। এই কি মানবিক শিল্পীর নঞর্থক সক্ষমতা (negative capability)? উন্নয়নের অভিঘাতে চাকমাদের সামাজিক ছক বদলে যায়, বৃত্তি বদল হয়ে যায়, অর্থনৈতিক কাঠামোও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। মানুষের চেতনা যেমন তার পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তেমনি মানুষের পরিবেশও তার চেতনার নির্মাণ করে। বৃহতের উপকারে যে মুষ্টিমেয় উদ্বাস্তু হয়ে যায় সেই ''সংখ্যালঘু'' - দের কথার ভদ্রতা, সরলতার সঙ্গে মিশে থকে '' প্রকৃতিকে চাতুর্য বুদ্ধি'' (পৃঃ ১৬)। আর্থ-সামাজিক আলোড়নে সৃষ্ট মানস পরিবর্তনকে পড়ে নিতে লেখক এক্ষেত্রে নির্মোহ ও বস্তুবাদী, এই উপলব্ধি থেকেই লেখক দেখেন দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুরতা যেন পরস্পরের সাথে সংশ্লিষ্ট ''এই শান্ত এবং অসামান্য কর্মশক্তিসম্পন্ন মানুষটির ভিতরে কোথায় একটি দারুণ নিষ্ঠুরতাও যেন আছে'' (পৃঃ ১৬); ''শান্ত ভাবলেশহীন এবং কিছুটা নিষ্ঠুর এদের মুখের চেহারা'' (পঃ ২৬); ''শান্ত ভাবলেশহীন এবং কিছুটা নিষ্ঠুর এদের মুখের চেহারা'' (পৃঃ ২৬); ''এই বলে জামিলা খাতুন তার কটা চোখ দুটি আমার দিকে তুলে এমন ক্রুর হিংসার দৃষ্টিতে তাকালো যে আমাকে শিউরে উঠতে হলো'' (পঃ ৩৯)। নিষ্ঠুরতার পাশাপাশিই হাত ধরাধরি করে আসে সামাজিক অপরাধপ্রবণতা। ছিনিয়ে খায়নি কেন?— দারিদ্র - লাঞ্ছিত এ সময়ে সেটাই বড় প্রশ্ন। কিন্তু বৃহতের ভাবনায় প্রাণিত লেখকের মনে অন্য প্রশ্নও উদিত হয় ঃ ''কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু ও মানুষের এই বিশাল জৈববৈচিত্র সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা কি কিছুতেই করা যায় না?'' (পৃঃ ১৭)। শিক্ষা এই চেতনা আনে অন্যভাবে চাকমা নেতাটির মধ্যে, আর তারই উল্টোদিকে থাকে সেই অশিক্ষিত লোলচর্ম প্রায় - বর্বর বৃদ্ধ চাকমা যে অভিযোগ করছে সেই অপদেবতার বিরুদ্ধে যার নামে সমন জারি করার ক্ষমতা তার নেই।

সংবেদনশীল লেখক এবার নিমগ্ন রাঙামাটির জলের করিডর ধরে যেতে যেতে লক্ষ্য করেন সেখানকার ভৌগোলিক পরিবর্তন ঃ ''কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকাগুলিতে, পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে নিম্নভূমিতে পানি জমে আছে। শেষ পর্যন্ত এইগুলিই রূপান্তরিত হয়েছে হ্রদে। রাঙামাটি এইভাবেই এক একটি দ্বীপশহর'' (পৃঃ ১৮)। জলের রং নীলাভ - সবুজ শ্যাওলার প্রভাবে কখনো ঘন নীল, কখনো ফ্যাকাশে সবুজ। দূরের পাহাড়গুলি, লেখকের অভূতপূর্ব রূপকের ব্যবহারে, হাতি রঙের। একটু যেন তার কেটে যায় যখন ২০ পৃষ্ঠায় শুনি '' অন্যান্য কীট - পতঙ্গের মিশ্র 'ঐক্যতান ওঠে'',

—'ঐকতান' নয় কেন? একি মুদ্রণপ্রমাদ? তবে ছোটখাট মুদ্রণপ্রমাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমস্ত বইটা জুড়েই; যেমন, পৃঃ ২২, লাইন ৩, প্রথম শব্দ; পৃঃ ২৫, লাইন ৬, দশম শব্দ; পৃঃ ৬২, দ্বিতীয় প্যারা, লাইন ২, ষষ্ঠ শব্দ; পৃঃ ৭৫, দ্বিতীয় প্যারা, পঞ্চম লাইন, প্রথম যতিচিহ্ন; একই পৃষ্ঠার পরবর্তী প্যারার তৃতীয় বাক্যের দ্বিতীয় শব্দ; পৃঃ ৭৮; শেষ প্যারা, ষষ্ঠ বাক্য, প্রথম শব্দ।

কিন্তু এগুলি নিছকই বাহ্যিক ব্যাপার। ''শ্রবণ-শোভন করার বদলে নির্দিষ্ট কেটো অর্থবাহিতা'' যে লেখকের পরবর্তী শৈলীগত মোড়, তিনিই হয়ে ওঠেন সুন্দরের উপাসক ও বিশ্লেষকঃ

''হয়তো বা দূরত্ব ও অস্পষ্টতাই সৌন্দর্য। হয়তো বা যা কিছু বিশাল, পরিমাপহীন আর অমিত শক্তিধারী, মানুষের অসহ্য কোলাহলের পটভূমিকায় স্তব্ধ শব্দহীন তাই সৌন্দর্য। আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত স্নায়ু আর দুর্বল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনকে শান্ত করে দেয় যা কিছু তারই মূল্য হচ্ছে সৌন্দর্য'' (পৃঃ ২০)।

সুন্দরকে বিবরের পাঁকে নয় জীবনের থেকে বৃহত্তর প্রেক্ষিতেই ছোঁয়া যায়, উন্মত্ত জনতার থেকে বহু দূরে, পাখির নীড়ের মত চোখ তোলা বনলতা সেনের দুদন্ড শান্তির প্রতিশ্রুতিতে।

কিন্তু প্রকৃতির সেই সুন্দরকে ধ্বংস করে প্রযুক্তির অভিশাপ। তাই ''কাপ্তাই যতই কাছে আসছে... কর্ণফুলীর ঘোলা পানিতে হ্রদগুলি সৌন্দর্য হারাচ্ছে'' (পৃঃ ২০)। কিন্তু লেখকের উপমা ব্যবহারের সৌন্দর্য তাতে কমে না। তাই ঘন সবুজ জঙ্গলকে তাঁর মনে হয়

''সবুজ বরফস্তূপের মতো'' (পৃঃ ২১) প্রাণের উত্তাপহীন। উপমা, রূপকের মত উল্লেখযোগ্য বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রযোগও ঃ ''গায়ের চামড়া পোড়া তামার মতো অথচ শীর্ণ সবল প্রতিটি কুশ্রী মেশানো'' (পৃঃ ২১); ''গায়ের চামড়া পোড়া তামার মতো অথচ শীর্ণ সবল প্রতিটি পেশী স্পষ্ট, '' (পৃঃ ৩২)। কর্ণফুলী নদীর ''গলা টিপে'' ধরলে, শুধু চট্টগ্রামের নিম্নাঞ্চলে বন্যা দেখা দেয় না, প্যাথেটিক্ ফ্যালাসির অপরূপ প্রয়োগে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর যে টুকু জল ছাড়া হয়, পাথরের পাশ কাটিয়ে বালি ভিজিয়ে যাবার পথে, যেটজুকু জল ''উপরের সেগুন শালের অরণ্যের দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকে'' (পঃ ২৩)। দৃশ্যমান সুন্দরের ত্বকজ অনুভবে ''হিম ঠান্ডা ছায়া'' (পৃঃ ২৪) পড়ে জঙ্গলে ছুঁয়ে যাওয়া কর্ণফুলীয়া স্রোতে। নান্দনিক সৌন্দর্যের মহিমা ম্লান হয়ে আসে যখন শরৎকালে গালিচার মতো পাতা, চোখ জুড়িয়ে যাওয়া, শস্য শ্যামলা ধানী জমি সত্ত্বেও ফুটে ওঠে ভাগচাষী বা প্রান্তিক চাষীর শোচনীয় চিত্রঃ ''নিজেদের জমিজমা নেই বলেই চলে। জোতদারের জমি আগে চাষ করে এদের জীবিকা অর্জন করতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনি, অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে এরা শধু অস্তিত্বটুকুই কোনোরকমে বজায় রাখতে পারে। অন্য সবদিক থেকেই জীবন পশুস্তরের। অন্ধকার গহ্বরের মতো ঘরগুলিতে এরা রাতে ঘুমোয় দিনের বাঁচার সংগ্রামে নেমে পড়ে জোয়াল বাঁধা গরুর মতো। এই-ই চলছে'' (পঃ ২৬)। অক্ষয়কুমার দত্ত-র ''পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন''— এর কথা মনে পড়ে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শবদেহ বহন করে যায় স্বাধীন দেশের কৃষীবলকুল। সম্পদের এই অসম বন্টনের ছায়া পড়ে কক্স বাজারের আবছা আঁধারে হিমেল হাওয়ায়। এই শহর একদিকে ''ছোট্ট বিষণ্ণ' অন্যদিকে সেখানে ছড়ানো রয়েছে ''মোটেল এবং কটেজ''-ও বলা হয়? (পৃঃ ২৭)। এরা বৌদ্ধ কিন্তু ''প্যাগোডাগুলির ইতিহাস বা বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে তাদের সম্ভবত কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই'' (পৃঃ ২৮)। এরা হাঙর খায়। এরা বাঙালি নয় (পৃঃ ৩২)। মূলস্রোতের বাঙ্লার জোয়ারে তাদের আঞ্চলিক ভাষা প্রান্তিক হয়ে গেছে, সে ভাষা লেখকের কাছে ''দুর্বোদ্ধ ...তার অর্থ করা দুষ্কর'' (পৃঃ ২৮)। এরা হাঙর খায়। এরা বাঙালি নয় (পৃঃ ৩২)। মূলস্রোতের বাঙ্লার জোয়ারে তাদের আঞ্চলিক ভাষা প্রান্তিক হয়ে গেছে, সে ভাষা লেখকের কাছে ''দুর্বোধ্য...তার অর্থ করা দুষ্কর'' (পৃঃ ৩০)। তিনি এ -ও বলেন, ''মোটেলগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে। কাজেই আকর্ষণ বৃদ্ধির কৃত্রিম ও বিকৃত উপায় গ্রহণে দ্বিধা নেই মালিকের'' (পৃঃ কক্সবাজারে আসেন তাঁরা পয়সা খরচ করার জন্যই আসেন, ফলতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রাহিত্যে শেষ পর্যন্ত তাঁরা বেরিয়ে পড়েন অস্বাভাবিক ও তীব্র উত্তেজনার অনুসন্ধানে এ অন্ধকার কক্সবাজারের ''নিস্তব্ধ ''আর্তনাদ তখন অশান্ত সিন্ধুর গর্জনও আর কানে আসতে নেয় না (পৃঃ ঐ)। উত্তেজনার যন্ত্রণা তীব্রতর হলে প্রাকৃতিক শক্তিও পরাভূত হয়। অন্যস্বত্বভোগী এই উত্তর - ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে ''যারা যোগানদার ও সংগ্রহক তাদের ভাগ্যে বিশেষ কিছু নেই'' (পৃঃ ৩১)।

শোষিত, ভাগ্যহীন মানুষগলোর জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাও হয়। কিন্তু ''এইসব পরিকল্পনার কতটা কাজে পরিণত করা গেছে সে প্রশ্ন অবান্তর'' (পঃ ঐ)। সেখানকার জেলেদের জীবন সংগ্রাম তন্নিষ্ঠ পাঠককে মনে করিয়ে দেয় ''রাইডার্স) ট্যু দ্য সী''-র মানুষগুলোর কথা। ''ছ মাস জেলেদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, পরিবার পরিজন নেই'' (পৃঃ ৩৩)। কুবেরের বিষয় আশয়ের খোঁজ কে রাখে? ''অসামান্য দক্ষতা এবং কঠিন শ্রমোপযোগী দেহ তাদের একমাত্র মূলধন। এই শ্রমও দক্ষতা নিয়োগ করে সে যা উপার্জন করে তার সিংহভাগ নিয়ে যায় মালিক।...নৌকোর যিনি মালিক, যাঁর সঙ্গে মাছের এবং সমুদ্রের কোনোরকম সাক্ষাৎ হয় না, তিনি এক অনন্যপূর্ব পন্থায় মৎস্য উন্নয়ন বিভাগের কাছ থেকে ইঞ্জিন এবং মাছ ধরার সমস্ত সাজসরঞ্জাম পেয়ে যান'' (পৃঃ ৩৪)। এই অর্থনৈতিক বাস্তবতার উৎপাদন সম্পর্কে মুৎসুদ্দীর উত্থান হয় আর ''এই অলস, চতুর পরশ্রমজীবী ব্যক্তিটি অবিশ্বাস্য মুনাফা করে থাকেন'' (পৃঃ ৩৪)। এমন অসহনীয় সময়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে ঃ ''কে বাঁচে কে বাঁচায়''?

কিন্তু এ প্রশ্ন কাকে করেন লেখক? কেন একটা প্রকৃত মানুষ খুঁজে বেড়ান যাঁকে এ প্রশ্নটা করা যায়? প্রশ্নের উত্তর দেবার মত দায়িত্বশীল নেতা কোথায় পাওয়া যাবে? লেখক কি ভুলে গেছেন ব্রেখ্টের গ্যালিলিওর কথা, যিনি মিথ্যাভাষণের পর তাঁর শিষ্য আঁদ্রিয়ার অভিযোগ — দুর্ভাগা সেই দেশ যার কোনো নায়ক নেই — শুনে বলেছিলেন, দুর্ভাগা সেই দেশ যার কোনো নায়কের প্রয়োজন হয়? তাই কে বাঁচায় কে বাঁচে এই প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত উস্কে দিতে হয় জনগণের মাথায়। উসকে দিতে হয় সেই আশি বছরের লোল চর্ম বুড়ো মানুষটির যার ''ফুসফুসের মধ্যে এতো বাঁশি বাজছিল'' যে সে মনে করিয়ে দেয় পার্ল সাইডেনস্ট্রিকার বাক্ - এর ''দ্য রিফিউজীস্'' - এর বৃদ্ধ পদযাত্রীটির কথা। উস্কে দিতে হয় ''পাবনার চাটমোহর ভাঙুরা এলাকায় বাঁশের মাচানের উপর কাঁথা - বালিশ, হাঁড়িকুড়ি, জগৎসংসার চাপিয়ে বন্যার তোড়ে ভেসে'' যাওয়া পরিবারটিকে যাদের নোয়ার মত কোন দৈব রক্ষাকর্তা নেই (পৃঃ ৩৬)। উদাসকে দিতে হয় সেই নিহত শৈশবের কথা ভেবে যার ''দুই চোখে অজানা মৃত্যুর আতঙ্ক'' (পৃঃ ঐ)। উস্কে দিতে হয় তখন যখন ''প্রেসনোট কথা বলে, পুলিশের রিপোর্ট কথা বলে, বেতার কথা বলে, টেলিভিশন কথা বলে, রাষ্ট্রপ্রভু, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী কথা বলতে কেউ কসুর করে না।'' (পঃ ৩৭) আর শব্দেরা শবযাত্রা করে অর্থহীনতার পরিকল্পিত বয়ানে। উস্কে দিতে হয় তখন যখন গুজরাত দাঙ্গার স্মৃতি জাগিয়ে তুলে ''কল্যাণপুরের বস্তি ঘিরে ফেলে প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক জীবনের শিকারের নেশায় মেতে উঠেছিল যারা, আগুনের লকলকে জিভ চেটে খেয়ে নিচ্ছিল মানবাধিকারের শেষ কণিকাটি পর্যন্ত, প্রাণভয়ে ভীত নারী আগুনের বেষ্ঠনী থেকে বেরিয়ে এলে তার কোলের শিশু টেনে নিয়ে অগ্নিকুন্ডে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল'' (পৃঃ ঐ)।

এমন আর্থ - রাজনৈতিক পরিস্থিতি নারীকেও নিয়ে যায় — সে-ও ''পুরুষ কিষেণের'' কাজ করতে বাধ্য হয়। শ্রম শোষণের যাঁতাকলে পড়ে থাকে শুধু ''নির্বিকার নির্লিঙ্গ'' মানুষের যন্ত্রায়ন। চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যহীনতায় নারী বাধ্য হয় পুরুষের অর্থেক মজুরিতে কাজ করতে। জাতিসত্তার আরোপিত ভাবনা খসে পড়ে এমন উপলব্ধিতে পৌঁছন লেখকঃ ''আমরা এক দেশে বাস করেও এক দেশে বাস করি না। এক ভাষায় কথা বললেও এক ভাষা বলি না'' (পৃঃ ৩৯)। জৈবিক আনন্দের তাড়নায় মানুষ মানুষীর দেহে নিয়ম করে পুঁতে যায় ''একটি করে বিষের গাছ'' (পৃঃ ৪০)। কিন্তু প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে। তাই সন্তান শোকাতুরা জামিলা খাতুন কে বাঁচে আর কেউ - বা বাঁচায় জানতে না চেয়ে যেমন করে পারে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে যেমন করে পারে বাঁচা আদায় করে নেবার সংগ্রামে নেমে পড়ে। কিন্তু তার সকল সংগ্রামই শেষ পর্যন্তঁধার পড়বে চোরা চালানোর অর্থনীতির ঘুর্ণিপাকে। সেই পাকে নিমজ্জিত তরুণী সমাজের কাছ থেকে পায় ''পথের কুকুরের জীবন উপহার'' (পৃঃ ৮৫) আর চোরাচালানোর রেলওয়ে গার্ড হয়ে ওঠে ''কুকুরের মতো মুখওয়ালা মানুষ'' যার ''টুকটুকে লম্বা জিভ থেকে টস্ টস্ করে দুবার লালা ঝরে'' পড়ে (পৃঃ ৪৭)।

চোরাচালানের একটি সহজ পণ্য গোরু। কিন্তু 'চাষির ঘরে গরু সহজে কেউ বেচতে চায় না''। ব্যাপারটা মায়া মমতার নয় (পৃঃ ৪৭)। গোরু তার উৎপাদনের মাধ্যম ওটা গেলে গফুরের মত শ্রেণীচ্যুত হতে হয়। কিন্তু বিডি আর - এর জওয়ান যখন ''তিনটে এঁড়ে''র সামনে এসে দাঁড়ায় আর শুরু করে হেনস্থার আলেখ্য তখন সৎপথে গরু বেচতে চলা সুবেদার মন্ডলের মনে হয় ''মানুষের দাপটে বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতিপালক আল্লাকেও তখন আর তার দরকার নেই ''ময়লা টাকায় ফর্সা জিনিস কিনতে কোনো অসুবিধে নেই'' (পৃঃ ৫২)। প্রশাসনিক অপদার্থতায় ''একেবারে স্বাভাবিক বাজারের মতোই চোরাচালানের বাজার'', আর আক্রান্ত হয় দেশীয় অর্থনীতি ঃ ''পাবনার তাঁতশিল্প অপ্রতিরোধ্য সংকটে। হাজার হাজার তাঁতি বেকার'' (পৃঃ ৫৪)। সৎশিল্পীর স্পষ্টবাদিতায় হাসান আজিজুল হক তাই বলে ওঠেন, ''আমাদের এই দুনীর্তিপরায়ণ শতমুখে শোষণকারী, শত লক্ষ হস্তে লুণ্ঠনকারী সরকারের ওপর কোনো ভরসা নেই'' (পৃঃ ৫৩)। এই সরকার জন্ম দেয় একটা বুভুক্ষু বাজারের ঃ ''যা পাচ্ছে গিলে খাচ্ছে। এদিকে অবস্থা হয়েছে এই যে লজ্জা মাথা মুখ ঢেকে ঘোমটা দিতে গিয়ে সাড়ি উঠেছে হাঁটুর উপরে'' (পৃঃ ঐ)। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''অসন্তোষের কারণ'' - এর কথা। জামা কিনতে গিয়ে পেলাম একটি মোজা আর এমন ভাবছি সেটা দিয়েই কোনমতে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করব। কিন্তু তা কি কখনও হয়? তাই শুধু

সমালোচনা নয়, বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোন থেকে আজিজুল তুলে ধরেন চোরাচালানের কারণগুলিও ঃ দেশের মধ্যে চাহিদার তুলনায় জোগান যথেষ্ট নয়; চোরাচালানকৃত ভারতীয় দ্রব্যগুলি ''গুণে, মানে ভালো, টেকসই এবং শেষ কথা দামে সস্তা''; আর বাঁচবার জন্য প্রয়োজন যে অনুপাতে মৌলিক ঠিক সেই অনুপাতে অন্ধ। ফলত ''অর্থনীতির ক্রুর নিয়মে বিদেশী পণ্যের কাছে, বিদেশী বাজারের কাছেধ তাঁরা অতি হীন দাসত্ব মেনে নিতে বাধ্য'' (পৃঃ ৫৫)। ভিন্নতর প্রেক্ষিতে স্মর্তব্য, একশ বছর আগের বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা। যদিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলা, তবু আমাদের মনে পড়ে মৌলনা আবুল কালাম আজাদের কথা ঃ ''The real problems of the country were economic, not communal'' (India wins Freedom p-184 Orient Long man, 1986). শুধু অর্থনৈতিক দর্শন নয়, অর্থনীতিক সংজ্ঞা নিরুপণেও লেখক সমান দক্ষ ঃ ''সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে যে দাসত্ব করে সেটার জন্যে কারো কাছে কোনো কৈফিয়ৎ নেই, সেটার নাম বৈধ ব্যবসা, আর তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের বাইরে যে দাসত্বের কারবার চলছে তারই নাম চোরাচালানের বাজার'' (পৃঃ ৫৬)। কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না কারণ ''স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষমতার সিংহাসন থেকে নেমে যেতে হয়''; আবার চোরাচালান বন্ধও করা যায় না কারণ তাহলে ''বিপ্লব আসন্ন হবে'' (পৃঃ ঐ)।

আসলে এর মূল কারণ নিহিত আছে অন্যখ্যনে। উন্নয়নের সর্বত্রগামী সুফলের অভাবই সেই কারণ। তাই তাঁর ''সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য রচনা'' গ্রন্থে আজিজুল বলেন, ''এখন নতুন প্রজন্ম বলে যাদের আমরা চিহ্নিত করছি তারা মোটামুটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গেই যুক্ত। এর নীচের কৃষককের যে ছেলেটি তরুণ হচ্ছে তাকে আমরা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আদৌ জায়গা করে দিচ্ছি কি না, তা ভেবে দেখার বিষয়'' (পৃঃ ৩৬)। এর সাথে, আবুল কালামের সদ্য উদ্ধৃত কথাটি মনে রেখে যোগ করুন ঃ ''পুঁজিবাদী বিশ্বের... মূল জিনিস হচ্ছে মুনাফা, আর তার শোষণের মূল ক্ষেত্রটা হচ্ছে শ্রম।...শ্রমটারও কোনো চরিত্র তার কাছে নেই,... সে প্রয়োজন না হলে সাম্প্রদায়িকতা উস্কায় না'' (পৃঃ ৩৭)

তদেব, একুশে বাংলা প্রকাশন, ২০০৮)। এই পুঁজিবাদ মানবতাবাদ নামে একটা অস্পষ্ট ধারণা আমদানি করে যা ''আলেকজান্দার, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি থেকে শুরু করে ছলিমুদ্দীন কালিমুদ্দিন'' পর্যন্ত সকলকে একই ছাতার তলায় এনে ফেলে, যদিও ''একটু চেষ্টা করলেই বড় লোকদের ঠোঁটে - মুখে রক্তের দাগ চোখে দেখা যায় রক্তের আঁশটে গন্ধও নাকে টের পাওয়া যায়'' (পৃঃ ৫৭)। এই পুঁজিবাদ ''দেশে কোটি কোটি ছদাই শেখ'' ছড়িয়ে দেয়, মনে পড়িয়ে দেয় পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের প্রেক্ষিতে উঠে আসা বনফুলের ''বুড়িটা'' গল্পের শেষ লাইনটার কথা। এই পুঁজিবাদের ফলেই ''দুদিকে দু মহাজন, মধ্যিখানে ছদাই শেখ'' (পৃঃ ৬০)। আর ''আত্মস্থ প্রলয়ে'' ''প্রাণের সন্ন্যাসী'' গেয়ে ওঠেন ''দুই প্রভু দুই দিকে, হে ভারত ভুলিও না, মাঝখানে তুমি ক্রীতদাস,/ তোমার পায়ের নীচে মাটি নেই, মাথার উপরে নেই স্বাধীন আকাশ'' (মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য)। উত্তর - ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বঞ্চিত বাংলাদেশে ''আসল কথাটি এই যে আমাদের নিজেদের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা, আমাদের নিজেদের বাজার ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে'' (পৃঃ ৬৩)। এমতাবস্থায়, ''সরকারি বন্দোবস্তের শুভযোগেই মানুষের দেশপ্রেম উঠে যাচ্ছে'' (পৃঃ ঐ)। এর সাথে যোগ হয় সরকারের মরণোত্তর ক্ষমতালিপ্সা ঃ ''দাঁত-নখ-থাবা দিয়ে যে সিংহাসন আটকে আছে, সিংহাসন উপুড় করলেও যে বাদুড়ের মতো ঝুলতে থাকবে। মরলেও ছাড়বে না'' (পৃঃ ৬৫)

রাষ্ট্রব্যবস্থার এই সংকটে আজিজুলের পক্ষে তটস্থ নিরাসক্তি নিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ একজন সচেতন ও সংবেদনশীল শিল্পী হিসেবে তাঁর জানা আছে, ''The Artist is the sensitive recipient of all that affects his country and his class; he is its ear, eye and heart; he is the voice of his time''. (Maxim gorky - How i learnt to write - On liternture? Vol. X\col-lected Works, 1982, p. 58)। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা জানে, সে সশস্ত্র কিন্তু জনসাধারণ নিরস্ত্র, আর লেখক জানেন, ''সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ রোষের মুখে পড়তে না হলে, ঐ যে বললাম, হস্তপদ - মুখবিহীন জনগণকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারলে অস্ত্রধারীর এত সাহস আসতে পারে'' (পৃঃ ৬৬)। আর কোনো কারণে জনগণের প্রতিরোধ দানা বাঁধলে নেমে আসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও তদনুসারী রাষ্ট্রীয় বয়ান, ''লোকেরা বলছে বুলেটের আঘাতে মানুষ মরছে, কিন্তু কই, লাশ তো পাওয়া যাচ্ছে না'' (পৃঃ৬৭)...''তারপরই চোখের উপর ভেসে ওঠে বরানগরের দেড়শ লাশ-মুখে/আলকাতরা মাখানো; একটার পর একটা ঠেলগাড়ী/ গঙ্গার দিকে যাচ্ছে; আসছে, যাচ্ছে আসলে—'' (কোনো কবি সম্মেলনে গান্ধীনগরে রাত্রি/ মনিভুষণ ভট্টাচার্য।) এই রাষ্ট্র যে সমাজের জন্ম দেয় সেই সমাজ যে শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল তার মর্মচিত্রটাও তুলে আনেন আজিজুল সংবাদিকতার বস্তুনিষ্ঠতায় ঃ ''নকল এখন বহুজনহিতায় বহুজনের বহু শ্রম মেশানো। যৌথকর্ম'' (পৃঃ ৭০)। এই মেরুদন্ডহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঋজু শিক্ষাপ্রশাসক আত্মদ্বন্দ্বে ভোগেন, যখন তিনি দেখেন, কড়াকড়ি করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে যায়। শুধু উচ্চ শিক্ষা নয়, প্রাথমিক শিক্ষারও একই হাল। তাই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন আজিজুলের লিখনে নিয়ে আসে পাশব চিত্রকল্প ঃ ''কোনো ট্যাঁ ফোঁ চলবে না, প্রাথমিক শিক্ষার গামলায় সবাইকে মুখ ডোবাতে হবে'' (পৃঃ ৭২)। বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি ''সেই প্রচারকে সম্বল করে বড়ো বড়ো দেশের কাছে বাঙালির হাত পাতাও চলে'' (পৃঃ ৭৪) আর ভুলে যাওয়া চলে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণাঃ ''...foreign aid is a method by which the United States maintains a position of influence and control around the world...'' (Teresa Hayter : "Adi as Imperalism", Pelican 1971, Foreward)

এই সচেতন বিস্মরণের সময় শিক্ষার্থীশূন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে হেড্‌মাস্টার ছাগলের সাথে যুদ্ধ করে ঘাস কাটেন (পৃঃ ৭৬ দ্রষ্টব্য) আর শিক্ষাহীন গণতন্ত্রের পরিণতিতে, একটুকু সুরাহা যার মধ্যে পাবার কোনো উপায় নেই, শুধুমাত্র টাকা, ক্ষমতা আর সীমাহীন রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে'' (পৃঃ ৭৭)। এই বিমূঢ় সময়ে দাঁড়িয়ে যে মানুষগুলো পরিবর্তনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, আজিজুল তাঁদের সামনে তুলে ধরেন করুণতর আরও যন্ত্রণাদায়ক বিকল্প - চিত্র ঃ ''এদিকে বিরোধী দলের জেতা প্রার্থী হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসছে, গলায় মালা দিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরছে, গরিলার মত ছাতিতে কিল মেরে ফূর্তি প্রকাশ করছে'' (পৃঃ ৭৯)।

তাই অন্তিম লগ্নে উপনীত হয়ে আজিজুল যখন প্রশ্ন তোলেন ঃ ''ক্ষমতা, লোভ, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, অসাধুতা আর বিশ্বাসঘাতকতায় গড়ে তোলা এই পাকের স্রোতকে ঠেকানো যাবে কি করে?'' (পৃঃ), তখন আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি, সময়ের দীর্ঘ সরণি পার হয়ে এসেও আর্থ - সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান তাঁর চোখের সামনে নেই। আমরা অনুধাবন করি বইটির ব্ল্যার্বে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল — ''কিন্তু মগজের মধ্যে দাউ দাউ করা জ্বলন্ত ও ফুটন্ত প্রশ্নটির উত্তর কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজলু হক শেষপর্যন্ত মেলাতে সক্ষম হন কি?''— সে প্রশ্নটা সহজ কিন্তু তার উত্তর বোধ হয় নিতান্তই অজানা কারণ, ''সবকিছুই হচ্ছে বর্তমান অবস্থাটা টিকিয়ে রাখার জন্য, এ অবস্থাটা ভেশ্রে নতুন কিছু একটা গড়ে তোলার ব্যাপারে কেউ রাজি নয়।'' (বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ, সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য রচনা, পৃঃ ৩৫, হাসান আজিজুল হক, একুশে বাংলা প্রকাশন, ২০০৮)।

কৃতজ্ঞতাঃ
মণিভূষণের কবিতা ঃ দায়বদ্ধতার দর্পনে শৈলীর দ্যুতি - অমর কুমার মিত্র, মহাযান, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।